গবেষণা সিরিজ-৯

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি ?

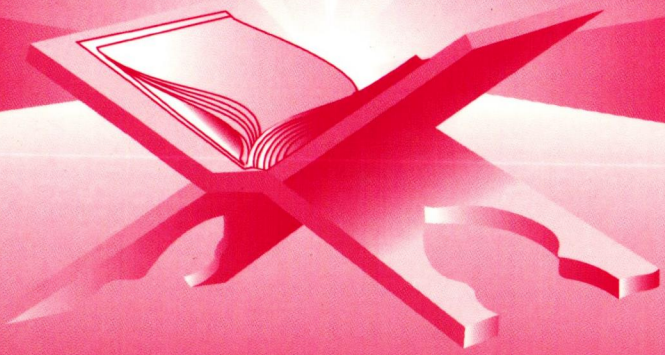

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ্ হবে কি?



প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

কুরআন গবেষণা ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০০১
৪র্থ সংস্করণঃ জানুয়ারী ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
আম্মার কম্পিউটার্স
৩৭/এ দক্ষিণ শাহজাহানপুর
ঢাকা ১২১৭
যোগাযোগ: ০১৯১৫-৭২৮০৪২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ২৮.০০ টাকা

সূচীপত্র

১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম ৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ ৭
৩. যে ফর্মুলা অনুযায়ী উৎসসমূহকে ব্যবহার করা হয়েছে ১৬
৪. মূল বিষয় ১৭
৫. ইসলামে অপবিত্রতার শ্রেণীবিভাগ ১৮
৬. 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির তথ্য ২০
৭. 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটির ব্যাপারে আল-কুরআনের তথ্য ২১
৮. 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে কুরআনের তথ্যের সারসংক্ষেপ ৩১
৯. 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটির ব্যাপারে হাদীসের তথ্য ৩২
১০. হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শের ব্যাপারে শিক্ষা ৪৭
১১. আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় ৫২
১২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা কতবড় গুনাহ্ ৫২
১৩. শেষ কথা ৫৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের

প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

بِهِ لِتُنْذِرَ مِنْهُ حَرَجٌ صَدْرِكَ فِي يَكُنْ فَلَا إِلَيْكَ أُنْزِلَ كِتَابٌ

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার

সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৯ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত

পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক

বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন—

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

অর্থঃ শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

عَنْ تَسْأَلُ جِئْتَ (ضر) لِوَابِصَةَ السَّلَامُ وَ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ قَالَ وَ وَ صَدْرَهُ بِهَا فَضَرَبَ أَصَابِعَهُ فَجَمَعَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الاثمِ وَ البِرِّ إِلَيْهِ اطْمَأَنَّتْ مَا البِرُّ ثَلَاثًا قَلْبَكَ اسْتَفْتِ وَ نَفْسَكَ إِسْتَفْتِ قَالَ تَرَدَّدَ وَ فِى الصَّدْرِ فِى حَاكَ مَا الاثمُ وَ القَلْبُ إِلَيْهِ اطْمَأَنَّ وَ النَّفْسُ النَّاسُ أَفْتَاكَ إِنْ وَ الصَّدْرِ فِى.

অর্থঃ রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং

বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لَا يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

يَعْقِلُونَ لَا الَّذِينَ الْبُكْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عِنْدَ الدَّوَابِّ شَرَّ إِنَّ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

يَعْقِلُونَ لَا الَّذِينَ عَلَى الرِّجْسَ وَيَجْعَلُ

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

السَّعِيرِ أَصْحَابِ فِي كُنَّا مَا نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ كُنَّا لَوْ وَقَالُوا

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ

হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।

(তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা 'বুরাক' নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer

disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

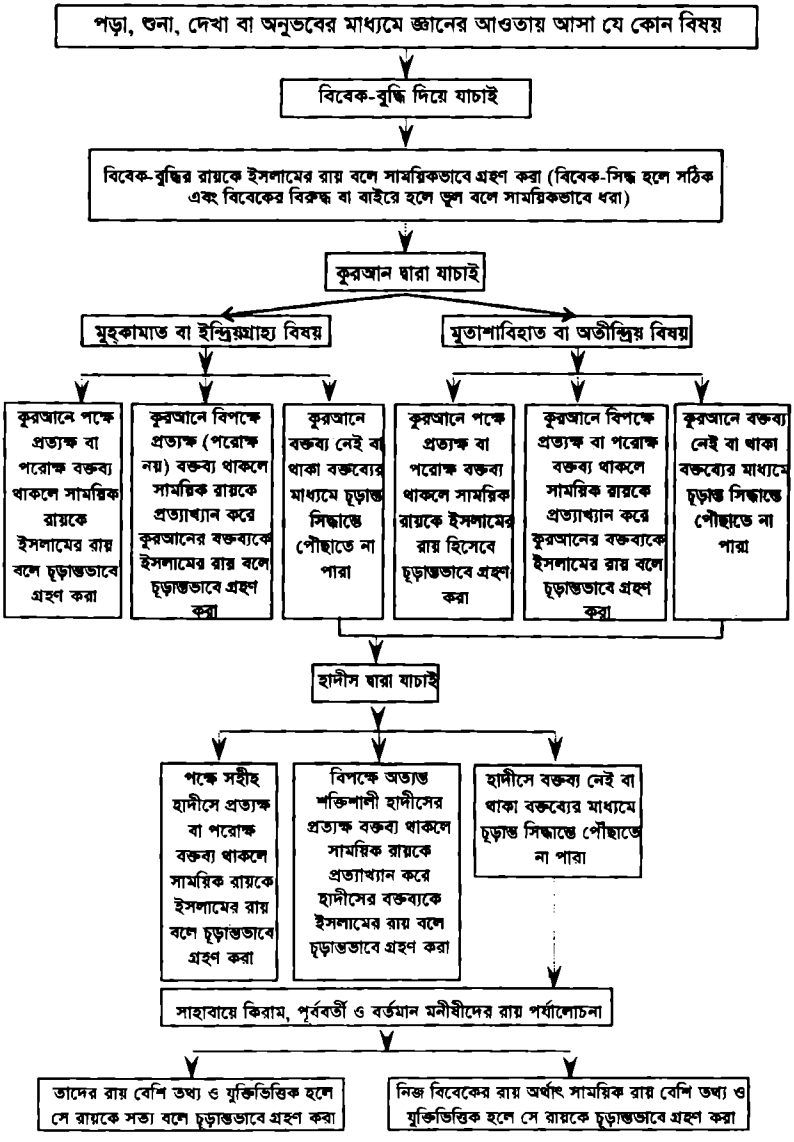

মূল বিষয়

মু'মিনের ১ নং আমল হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। আর শয়তানের ১ নং কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান থেকে মু'মিনকে দূরে রাখা বা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে নানা রকম বাধার সৃষ্টি করা। অর্থাৎ সকল মুসলিমের জন্যে সব ফরজের বড় ফরজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সব থেকে বড় গুনাহ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি 'মু'মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে।

যে কোন সত্তা তার ১ নং কাজে সফল হওয়ার জন্যে সর্বাধিক চেষ্টা-সাধনা করবে, এটা স্বাভাবিক। তাই শয়তান তার ১ নং কাজে অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষ বা মুসলিমদের দূরে রাখার কাজে সফল হওয়ার জন্যে সব থেকে বেশি চেষ্টা-সাধনা করবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, ১ নং কাজটিতে তার (শয়তানের) সফলতা দেখে। অনিষ্ঠাবান মুসলিমদের কথা দূরে থাক, আজ পৃথিবীর অধিকাংশ নিষ্ঠাবান মুসলিমেরও কুরআনের জ্ঞান নেই। আরো অবাক লাগে যে সকল কথার মাধ্যমে শয়তান মুসলিমদের কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রেখেছে বা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর ধরন দেখে। ঐ কথাগুলো যে অযৌক্তিক বা ধোঁকাবাজি, তা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির আলোকেও বুঝা সহজ। তারপরেও একটি জাতির অধিকাংশ লোক কিভাবে তা মেনে নিলো, এটা একটা অবাক কাণ্ড।

'অজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না'-এ কথাটা বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত। আর এর ব্যাখ্যা থেকে মুসলিমরা ব্যাপকভাবে জানে ও মানে যে- মুসলিমরা

১. অজু ছাড়া কুরআন মুখস্থ পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করে বা ধরে পড়া যাবে না।

২. অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা মহাপাপ।

হাফেজ ছাড়া বাকি সব মুসলিমের কুরআনের অল্পই মুখস্থ থাকে। আবার বেশির ভাগ মুসলিমের তাদের জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় অজু থাকে না। তাই কথাটি অধিকাংশ মুসলিমের, জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময়, কুরআন ধরে পড়ার পথে এক বিরাট বাধা। অর্থাৎ কথাটি অধিকাংশ মুসলিমের জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক

বিরাট বাধা। কথাটি যদি চালু না থাকত, তবে সকল বেঅজু মুসলিমের পকেটে বা ব্যাগে কুরআন থাকতো এবং তা বাসায়, অফিসে বা পথে-ঘাটের যে কোন অবসর সময়ে পড়তে কোন অসুবিধা হত না। ফলে তাদের কুরআন পড়ার অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময় অনেক বেড়ে যেত এবং অনেক অনেক মুসলিম সহজে কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হতে পারত। তাই কথাটা মুসলিমদের মধ্যে, কুরআনের জ্ঞানী লোক কম থাকার একটা প্রধান কারণ।

কথাটি যদি কুরআন-হাদীস সম্মত না হয় তবে তা উচ্ছেদ করা গেলে ইসলাম তথা মুসলিমদের অপরিসীম কল্যাণ হবে ভেবে কথাটার বিপক্ষে বা পক্ষে কুরআন-হাদীস ও বিবেকের কী কী তথ্য আছে তা পর্যালোচনা করে জাতির সামনে উপস্থিত করাই আমার এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

ইসলামে অপবিত্রতার শ্রেণী বিভাগ

ইসলামী জীবন বিধানে অপবিত্রতার শ্রেণী বিভাগের চিত্ররূপটি হল-

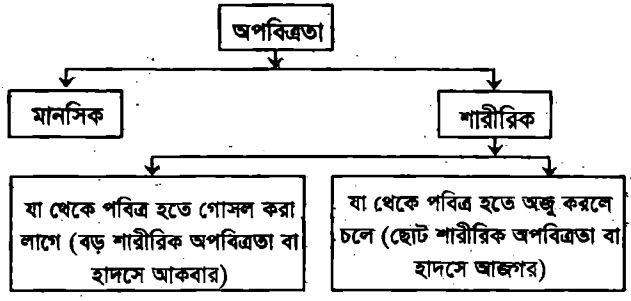

এবার চলুন বিভিন্ন ধরনের অপবিত্রতা এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জানা যাক-

মানসিক অপবিত্রতা

ইসলামী জীবন বিধানে ঐ সব ব্যক্তিকে মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র বলে যারা আক্বিদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে শিরকে নিমজ্জিত এবং যারা কুরআনের যে কোন একটি বক্তব্যকেও মনের দিক দিয়ে অবিশ্বাস বা ঘৃণা করে। ইসলামী পরিভাষায় এদের মুশরিক ও কাফের বলা হয়। এই ধরনের ব্যক্তিরা গোসল করলেও মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র হবে না। কারণ, গোসল হচ্ছে শারীরিক অপবিত্রতা দূর করার উপায়।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহের সকল বক্তব্যকে মন দিয়ে বিশ্বাস ও ভক্তি করে, সে মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র। কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়ার আগ পর্যন্ত এটাতো আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে বুঝার উপায় নেই। তাই ইসলামী জীবন বিধানে মনের দিক দিয়ে পবিত্র ব্যক্তি, যখন মুখে কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দেয়, তখনই শুধু তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে (Formally) মু'মিন বা ঈমানদার হিসাবে ধরা হয়। আর সে যখন কালেমার দাবি অনুযায়ী কাজ করতে আরম্ভ করে, তখন তাকে মুসলিম বলা হয়। এরকম ব্যক্তিরা শারীরিক দিক দিয়ে অপবিত্র হলেও মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র বা ঈমানদার থাকে।

আবার কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে মুখে কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দিয়েছে এবং ইসলামের কিছু কাজও (আমল) করছে কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে কুরআন ও সুন্নাহের সকল বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস আনতে পারেনি, তবে সে মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র রয়েই যাবে। এই ধরনের ব্যক্তিকে ইসলামী জীবন বিধানে মুনাফেক বলা হয়। কুরআন বলছে, কিয়ামতে এদের স্থান হবে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। মানসিক পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলো কুরআন ও হাদীসে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা পরে আসছে।

শারীরিক অপবিত্রতা

ক. বড় ধরনের শারীরিক অপবিত্রতা

ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী দু'ভাবে এ ধরনের অপবিত্রতা অর্জিত হয়-

১. যৌন মিলনের পর বা বীর্যপাতের পর এবং

২. মেয়েদের মাসিক বা প্রসূতি স্রাব চলা অবস্থায়। এ ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করা প্রয়োজন।

খ. ছোট ধরনের শারীরিক অপবিত্রতা

এ ধরনের অপবিত্রতা হতে শরীর পবিত্র করার উপায় হচ্ছে অজু করা। অনেক কারণেই শরীর এরকম অপবিত্র হয়। তবে তার মধ্যে সব থেকে বেশি যা মানুষের হয় তা হচ্ছে প্রস্রাব, পায়খানা ও পায়ু পথে বায়ু নির্গত হওয়া।

পবিত্রতা-অপবিত্রতার ব্যাপারে ইসলামী জীবন বিধানের উপরে বর্ণিত মৌলিক কথাগুলো জানার পর চলুন এখন, বিভিন্ন ধরনের অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া, স্পর্শ করা ও শোনার ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদিসের তথ্যগুলো দেখা যাক।

'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ'-কথাটির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির' তথ্য

তথ্য-১

❑ সম্মানের দৃষ্টিকোণ

'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ'-কথাটার পক্ষে সাধারণ যে যুক্তি দেখানো হয় তা হচ্ছে, এটা কুরআনকে সম্মান দেখানো। কোন গ্রন্থের, বিশেষ করে ব্যবহারিক (Applied) গ্রন্থের, সব চেয়ে বড় সম্মান হল, তা পড়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা। আবার সাধারণ বিবেকের সর্বসম্মত রায় হচ্ছে, কোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে এমন বিষয় দ্বারা ঐ গ্রন্থকে সম্মান করা বুঝায় না। বরং তা হল ঐ গ্রন্থের চরম অসম্মান।

'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ'-কথাটা কুরআনের মত ব্যবহারিক গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের পথে একটা বিরাট বাধা। তাই, সাধারণ বিবেক অনুযায়ী কথাটার দ্বারা কুরআনকে সম্মান করা নয় বরং চরম অসম্মান করা হয়। সুতরাং ঐ রকম একটা তথ্য ইসলামের বিষয় হওয়ার কথা নয়।

তথ্য-২

❑ গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ

মুসলিম সমাজে যে কথাটি ইসলামের কথা হিসাবে চালু আছে তা হচ্ছে 'অজু ছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ নেই কিন্তু স্পর্শ করলে গুনাহ।' কোন গ্রন্থ পড়ার কাজটি, তা স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিশেষ অবস্থায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে না এটি একটি সম্পূর্ণ বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজেই বলা যায় অজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না-কথাটি সম্পূর্ণ বিবেক বিরুদ্ধ। বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কথাটি হবে-

ক. অজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে তা স্পর্শও করা যাবে।

খ. অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা না গেলে তা পড়াও যাবে না।

তথ্য-২

❑ অন্য গ্রন্থের সহিত ব্যতিক্রমের দৃষ্টিকোণ

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ তা পড়ে জ্ঞান অর্জন করবে এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। অন্যদিকে কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, তাই মানুষের লেখা যে কোন বইয়ের তুলনায় সব দিক থেকে তার একটা বিশেষত্ব থাকবে। যেমন কুরআন নির্ভুল কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থ তা নয়, কুরআনের সাহিত্য মানের সঙ্গে অন্য কোন বইয়ের সাহিত্য মানের তুলনা হয় না ইত্যাদি। তাই অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ছোঁয়ার ব্যাপারেও অন্য গ্রন্থের থেকে কিছু ব্যতিক্রম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম এমন হওয়া সাধারণ বিবেক বিরুদ্ধ যে, তা কুরআন নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের পথে অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করবে। 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ'-কথাটা কুরআন ধরে পড়ার পথে অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে একটা বিরাট বাধা।

'তাই গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ'-কথাটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় দিকই রক্ষা করতে পারে। কারণ, একদিকে তা যেমন অপবিত্রতার একটি অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে না দিয়ে কুরআনের ব্যতিক্রমধর্মী গুণ বজায় রাখবে; অন্যদিকে তা বেশিক্ষণ মানুষকে কুরআন ধরে পড়া থেকে দূরে রাখবে না। কারণ, একজন মুসলিম বেশি সময় গোসল ফরজ অবস্থায় থাকে না। পরবর্তী নামাজের আগে তাকে অবশ্যই গোসল করে পবিত্র হতে হয়। তাই বিবেক বলে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ হলে তা গোসল ফরজ অবস্থায় হওয়াই সকল দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত।

'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটির ব্যাপারে আল-কুরআনের তথ্য

তথ্য-১

❑ গুনাহের কাজে সহায়তার দৃষ্টিকোণ

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী গুনাহের কাজে সহায়তা করা গুনাহ। যেমন, সুদ খাওয়া, দেয়া, লেখা, সুদের সাক্ষী হওয়া সবই গুনাহ। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী শয়তানের ১নং কাজ হল মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। অর্থাৎ সব গুনাহের বড় গুনাহ হল কুরআনের জ্ঞান থেকে

দূরে থাকা। 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ভীষণভাবে কমিয়ে দেয়। কারণ মানুষের জীবনের বেশিরভাগ সময় অজু থাকে না। আর হাফিজ ব্যতীত অন্য সবাইকে কুরআন ধরেই পড়তে হয়। অর্থাৎ 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটি সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজটি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিরাট সহায়তা করে। তাই কুরআন অনুযায়ী এমন একটি কথা কোন মতেই ইসলামের কথা হতে পারে না।

তথ্য-২

❑ বিপরীতধর্মী বক্তব্য হওয়ার দৃষ্টিকোণ

সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য বা তথ্য নেই। কুরআন অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সব ফরজের বড় ফরজ। আর 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটি ঐ সব ফরজের বড় ফরজ কাজটি করার পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ তথ্য দুটি পরস্পর বিরোধী। কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সব ফরজের বড়ো ফরজ তথ্যটি কুরআনের একটি স্পষ্ট তথ্য। তাই এ তথ্যের বিপরীত হওয়ার কারণে 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটি কুরআন তথা ইসলামের কথা হতে পারে না।

তথ্য-৩

❑ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিবেক-বিরুদ্ধ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন তথা ইসলামে চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক-বিরুদ্ধ থাকবে এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) কোন বিষয় নেই। চিরন্তনভাবে বিবেকের বাইরের বিষয় হবে কুরআনের অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয়সমূহ। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস অনুযায়ী ইসলামে বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কুরআন পড়া, স্পর্শ করা এবং অজু-গোসল সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। সুতরাং সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের পরোক্ষ বক্তব্য অনুযায়ী ঐ সকল বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিবেক-বিরুদ্ধ কোন কথা কুরআনের কথা নয় বা কুরআনের কথা হবে না।

অজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না- একটি সম্পূর্ণ বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। তাই এই আয়াতের আলোকে বলা যায় একথাটি কুরআন তথা ইসলামের কথা হতে পারে না। এ আয়াতের আলোকে এ বিষয়ে তথ্যটি নিম্নের দু'টির একটি হবে-

ক. অজু ছাড়া কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা উভয়টি যাবে,

খ. অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা ও পড়া কোনটি যাবে না।

আল-কুরআন থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হল ঐ বিষয়ে কুরআনের সকল আয়াতের বক্তব্য পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা। আর ঐ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা যেন অন্য কোন আয়াতের বিপরীত না হয় এবং অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা স্পষ্ট আয়াতের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।

তাই পূর্বে উল্লিখিত তথ্য দুটি এবং পরে আসা তথ্যের সাথে মেলালে সহজে বলা যায় সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের তথ্য হচ্ছে-অজু ছাড়া কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা উভয়টি সিদ্ধ।

তথ্য-৪

❑ **সূরা ওয়াকি'আর ৭৯ নং আয়াতের দৃষ্টিকোণ**

'বে-অজু কুরআন স্পর্শ করা যাবে না বা গুনাহ'-এ কথা যারা বিশ্বাস করেন এবং বলেন, তাদের নিকট ঐ কথাটার ব্যাপারে দলিল জানতে চাইলে, প্রায় সবাই যে আয়াতটি বলেন, তা হচ্ছে-

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ.

তাই আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ মহান আল্লাহ আয়াতটিতে কী বলেছেন, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

আয়াতখানির মূল শব্দ (Key words) হচ্ছে তিনটি। যথা-মাস্ (مَسٌّ), হু (هُ) এবং মুতাহ্হারুন (مُطَهَّرُوْنَ)। এই তিনটি শব্দের সঠিক অর্থ নিতে পারলে আয়াতখানির সঠিক বক্তব্য বোঝা যাবে। অন্যথায় তা কখনই সম্ভব হবে না।

মূল শব্দ তিনটি অপরিবর্তিত রেখে আয়াতখানির সরল অর্থ দাঁড়ায়- 'মুতাহ্হারুন ব্যতীত ঐ কুরআন কেউ মাস্ করতে পারে না।

আয়াতখানির মূল তিনটি শব্দের যে সকল অর্থ আরবী ভাষায় হয় বা যা আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তা হল-

❑ মুতাহ্হারুন (مُطَهَّرُوْنَ)

১. অজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া মানুষ,

২. নিষ্পাপ সত্তা বা ফেরেশতা।

❑ ঐ কুরআন:

১. পৃথিবীর কুরআন

২. লওহে মাহফুজে রক্ষিত কুরআনের মূল কপি।

❑ মাস্ (مَسٌّ)

১. স্পর্শ করা,

২. শাস্তি ভোগ করা (সূরা আল-আন'আমের ৪৯ নং আয়াত),

৩. অত্যাচারে জর্জরিত করা (সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াত),

৪. সম্মুখীন হওয়া বা ধারে-কাছে আসা (সূরা হিজরের ১৫নং আয়াত),

৫. স্ত্রী সহবাস (সূরা মায়েদার ৬ নং এবং নিসার ৪৩ নং আয়াত),

৬. কুপ্ররোচনা বা ধোঁকা দেয়া (সূরা বাকারা, ২৭৫নং আয়াত)।

আল-কুরআনের তাফসীরের নীতিমালা (উসূল) হল একটি আয়াতের কোন শব্দের যদি একাধিক অর্থ হয় তবে শব্দটির সে অর্থটি নিতে হবে যেটি নিলে-

❑ আয়াতটির অর্থ আগের ও পরের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়

❑ অন্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়,

❑ শানে নুযুলের (নাযিলের পটভূমি) সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়,

এরপরও যদি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছানো না যায় তবে পর্যালোচনা করতে হবে ঐ বিষয়ে-

❑ রাসূল (সা.) এর বক্তব্য তথা হাদীস,

❑ সাহাবায়ে কিরামগণের বক্তব্য,

❑ পূর্ববর্তী মনীষীদের বক্তব্য,

❑ বর্তমান মনীষীদের বক্তব্য।

কুরআন শরীফের আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে উপরোক্ত তথ্যগুলো সামনে রেখে চলুন এখন আয়াতখানির সঠিক অর্থটি বের করার চেষ্টা করা যাক-

❑ আয়াতখানির শানে নুযুল

মক্কার কাফেররা রাসূল (সা.) কে গণক, যাদুকর ইত্যাদি বলত। তারা বলে বেড়াতো শয়তান কুরআন নিয়ে এসে মুহাম্মাদ (সা.) কে পড়ে পড়ে শিখিয়ে দেয়। তারপর মুহাম্মাদ (সা.) সেটা অন্যদের জানায়।

কাফেরদের এই প্রচারণার উত্তরে মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতখানিসহ আরো কয়েকটি আয়াতে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন সূরা শুয়ারার ২১০-২১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.

অর্থ: এটা (কুরআন) নিয়ে শয়তান অবতীর্ণ হয় নাই। এ কাজ তাদের জন্যে শোভনীয় নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। তারাতো (অবতীর্ণের সময়) এটা শোনা হতেও দূরে চলে যেতে বাধ্য হয়।

(শুয়ারা : ২১০-২১২)

❑ শানে নুযুল এবং আগের ও পরের আয়াতের বক্তব্যের আলোকে আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ

আয়াত খানির আগের ও পরের আয়াতসমূহ অর্থাৎ সূরা ওয়াকিয়ার ৭৭-৮১ নং আয়াত

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ. تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.

অর্থ: আলোচ্য (৭৯ নং) আয়াতের মূল তিনটি শব্দ হুবহু রেখে আয়াত ক'খানির সরল অর্থ হবে- উহা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন। যা আছে এক সংরক্ষিত গোপন কিতাবে লিপিবদ্ধ। মুতাহ্হারুনরা ব্যতীত কেউ তা (ঐ কুরআন) 'মাস' করতে পারে না। এটাতো মহাবিশ্বের রবের নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। এই বক্তব্য কি তোমাদের ধারণাকে মলম দিয়ে ঢেকে দেয় না (মিথ্যা প্রমাণিত করে না)?

ব্যাখ্যা: ৭৯ নং আয়াতে ঐ কুরআন বলতে যে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে সে কুরআন সম্বন্ধে ৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তা আছে এক সংরক্ষিত গোপন কিতাবে। 'সংরক্ষিত গোপন' শব্দ দুটির মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় এখানে লওহেমাহফুজের কুরআন তথা কুরআনের মূল কপিখানি যা লওহেমাহফুজে 'সংরক্ষিত' আছে তার কথা বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীর কুরআন সংরক্ষিত ও গোপন কোনটিই নয়। যে কেউ পৃথিবীর কুরআন যেকোন অবস্থায় ধরতে, পড়তে ছিঁড়তে ও অপমানিত করতে পারে।

এ তথ্যগুলো সামনে রেখে ৭৯নং আয়াতের মূল শব্দ তিনটির দু'ধরনের অর্থ ধরে আয়াতখানির যে দু'ধরনের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তা হল-

ক. উহা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন, যা লওহেমাহফুজে সংরক্ষিত আছে। নিষ্পাপ ফেরেশতা ব্যতীত ঐ লওহেমাহফুজের কুরআনের ধারে কাছেও কেউ যেতে পারে না। (পৃথিবীর কুরআন) মহাবিশ্বের রবের নিকট থেকে নাযিল হওয়া। এ বক্তব্য কি তোমাদের ধারণাকে (শয়তান কুরআন নিয়ে এসে মুহাম্মাদকে শুনায়) মিথ্যা প্রমাণিত করে না?

খ. উহা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন, যা লওহেমাহফুজে সংরক্ষিত আছে। অজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া মানুষ ব্যতীত ঐ লওহেমাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (পৃথিবীর কুরআন) মহাবিশ্বের রবের নিকট থেকে নাযিল হওয়া। এ বক্তব্য কি তোমাদের ধারণাকে (শয়তান কুরআন নিয়ে এসে মুহাম্মাদকে শুনায়) মিথ্যা প্রমাণিত করে না?

আয়াত ক'খানির এ দু'টি ব্যাখ্যার কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে এ প্রশ্ন করলে আমার তো মনে হয় পৃথিবীর সকল বিবেকসম্মত মানুষ একবাক্যে বলবে প্রথমটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে এবং দ্বিতীয়টি কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই তাফসীরের মূল নীতিমালার আলোকে সহজেই বলা যায় সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হল-'নিষ্পাপ ফেরেশতা ব্যতীত লওহেমাহফুজের কুরআনের ধারে-কাছেও কেউ যেতে পারে না'।

চলুন, এখন দেখা যাক আয়াতটির তরজমা ও তাফসীরের ব্যাপারে বিখ্যাত তাফসীরকারকগণ কী বলেছেন-

ক. বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, 'যারা পূতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। অর্থাৎ শুধু ফেরেশতারা এটা স্পর্শ করে থাকেন'। তাহলে ইবনে কাসীর (রহ.)•ঐ আয়াতে مُطَهَّرُوْنَ এর অর্থ 'নিষ্পাপ ফেরেশতা' বলেছেন। (পৃষ্ঠা নং ২৮৫ ও ২৮৬, ১৭তম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ)

খ. মুফতি শফি (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ মা'আরেফুল কুরআনে এই আয়াতটির তাফসীরে লিখেছেন-

- ❑ বিপুল সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাফসীরবিদের মতে, সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতে مُطَهَّرُوْنَ বলতে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে যারা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, ঐ আয়াতে مُطَهَّرُوْنَ শব্দের অর্থ 'নিষ্পাপ'।
- ❑ কিছু সংখ্যক তাফসীরবিদ মনে করেন, কুরআনের ঐ বক্তব্য মানুষের জন্যেও প্রযোজ্য হবে এবং পবিত্র বলতে তাদের বুঝানো হবে যারা 'হদসে আকবর' ও 'হদসে আসগর' থেকে পবিত্র। (পৃষ্ঠা নং ৩০, ৮ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

গ. হজরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তরজমা ও তাফসীর করেছেন, 'তাকে নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না'।

ঘ. মাওলানা মওদূদী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, এই আয়াতে مُطَهَّرُوْنَ শব্দ ফেরেশতাদের বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে যারা সর্বপ্রকার অপবিত্র আবেগ-ভাবধারা ও লালসা-বাসনা হতে পবিত্র। অর্থাৎ মাওলানা মওদূদীও (রহ.) مُطَهَّرُوْنَ অর্থ নিষ্পাপ বলেছেন। (পৃষ্ঠা নং ১২৫-১২৯, ১৭ তম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ)

❑❑ সুতরাং 'নিষ্পাপ ফেরেশতা ব্যাতীত কেউ লোহমাহফুজের কুরআনের ধারে-কাছেও যেতে পারে না' সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের এ ব্যাখ্যার পক্ষে আছে-

- ❑ শানে নুযুল,
- ❑ আয়াতটির আগের দুটো আয়াতের বক্তব্য,
- ❑ পরের দুটি আয়াতের বক্তব্য,
- ❑ একই বিষয়ে অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য,
- ❑ বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য,
- ❑ বিপুল সংখ্যক তাবেয়ীর বক্তব্য।

আর 'অজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া ব্যক্তিরা ব্যতীত পৃথিবীর কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না' আয়াতখানির এ ব্যাখ্যার পক্ষে আছে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক তাফসীর কারক।

তাই নিশ্চয়তাসহকারেই বলা যায় সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, 'অজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া ব্যক্তিরা ব্যতীত কেউ পৃথিবীর কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না' এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে শানে নুযুল, কুরআনের অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য, বিপুল সংখ্যক সাহাবীর বক্তব্য এবং বিপুল সংখ্যক তাবেয়ীর বক্তব্যকে অস্বীকার করে কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের বক্তব্যকে মেনে নেয়া। অর্থাৎ এটি ইসলামে কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাই 'কুরআন স্পর্শ করার আগে অজু করতে হবে' কথাটার ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন, এ তথ্যটা একেবারেই ঠিক নয়। এই অতীব সত্য কথাটি মুফতি শফী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন- 'যেহেতু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী মতভেদ করেছেন, তাই অনেক তাফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কুরআনপাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কুরআনের আয়াতকে (সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত) দলিল হিসেবে পেশ করেন না। তারা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র'। (সে হাদীসগুলোয় কী তথ্য আছে তা ব্যাখ্যাসহকারে পরে আসছে।)

তথ্য-৫

❑ নামাজ আদায় ও কুরআন আরম্ভ করার আগে যা করার কথা কুরআনে উল্লেখ আছে এবং যা করার কথা তথায় উল্লেখ নেই, তার দৃষ্টিকোণ

নামাজের আগে অজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক (ফরজ) আমল। আর মৌলিক বলেই মহান আল্লাহ আল কুরআনের ২টি সূরায় এ তথ্যটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে রেখেছেন। চলুন, এখন দেখা যাক নামাজের আগে অজু-গোসল করার কথাটা আল্লাহ কুরআনে কিভাবে উল্লেখ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى

سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অর্থঃ হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা নামাজের জন্যে উঠবে তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। মাথা এবং গোড়ালি পর্যন্ত পা মাসেহ করবে। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে গোসল করে পবিত্র হবে। আর যদি রোগাক্রান্ত হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে এসে থাকে বা তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নিবে। অর্থাৎ ঐ মাটির দ্বারা (মাটির পর হাত রেখে সেই হাত দ্বারা) স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মুছে ফেলবে। (এ আদেশ দ্বারা) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না। বরং এর দ্বারা তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত (কল্যাণ কামনা) পরিপূর্ণ করে দিতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আর সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ আদেশটা এভাবে উল্লেখ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাজের ধারে-কাছেও যাবে না, যতক্ষণ না বুঝতে পার কী পড়ছো। অনুরূপভাবে গোসল ফরজ অবস্থায়ও নামাজের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল

কর। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে এসে থাকে বা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে থাকে কিন্তু পানি না পাওয়া যায়, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিবে অর্থাৎ ঐ মাটি দ্বারা মুখ এবং হাত মাসেহ করে নিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা ক্ষমাশীল।

সুধী পাঠক, লক্ষ্য করুন, নামাজ পড়ার আগে অজু বা গোসল করে শরীর পবিত্র করা ইসলামের একটা মৌলিক কাজ বা আমল বলে মহান আল্লাহ তা বিস্তারিতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, আল কুরআনের অনেকটা জায়গা নিয়ে, স্পষ্টভাবে, জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআন নামাজের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার আগে পবিত্রতা অর্জন করা দরকার বা গুরুত্বপূর্ণ হলে, আল্লাহর তা আরো বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে, কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়ার কথা। কিন্তু কুরআন পড়া বা স্পর্শের আগে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এমন একটি কথাও আল-কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই (সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ এ বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন বলে যে কথা বলা হয় তা মোটেই সঠিক নয়, সেটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।) পক্ষান্তরে কুরআন পড়ার আগে যে কাজটি অবশ্যই করতে হবে, তা মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নাহলের ৯৮ নং আয়াতে নিম্নোক্তভাবে-

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অর্থ: অতএব যখনই তোমরা কুরআন পাঠ করতে শুরু করবে, তখনই অভিশপ্ত শয়তান হতে (শয়তানের ধোঁকাবাজি হতে) আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআন পড়া শুরু করার সময় পবিত্রতা অর্জন করতে না বলে যে কাজটি বাধ্যতামূলকভাবে করতে বলেছেন তা হল, ইবলিস শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ, কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে সরানো হচ্ছে শয়তানের ১ নং কাজ এবং সে কাজে শয়তান সফল হওয়ার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা করে। তাই আল্লাহর সাহায্য না পেলে শয়তানের ঐ সকল ধোঁকাবাজিমূলক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কুরআন দেখে পড়া, মুখস্থ পড়া বা পড়ানোর আগে যা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে বলে আল্লাহ জানিয়েছেন, তা হচ্ছে শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া। অন্যদিকে কুরআন পড়া, স্পর্শ করা অথবা অন্য কোন কাজের আগে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এমন কোন কথা আল্লাহ কুরআনের কোথাও উল্লেখ করেননি।

তাই কুরআন পড়া, পড়ানো বা স্পর্শ করার আগে অজু বা গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এমন কোনো কথা যদি সহীহ হাদীসে থেকেও থাকে (অজু করার কথা নেই) তবে তা হবে ইসলামের একটা অমৌলিক বিষয়। কারণ, যে বিষয়টা কুরআনে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে উল্লেখ নেই বা তা কুরআনের উল্লেখিত কোনো মূল বিষয়ের মৌলিক বাস্তাবায়ন পদ্ধতিও নয়, তা সহীহ হাদীসে থাকলেও সেটা হবে ইসলামের একটা অমৌলিক বিষয়। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোন্‌গুলো তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে কুরআনের তথ্যের সার-সংক্ষেপ

ক. আল-কুরআনের মাধ্যমে শুধুমাত্র নামাজ পড়ার আগে অজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়ার প্রত্যক্ষ (Direct) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্য কোন কাজ করার আগে অজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়ার প্রত্যক্ষ (Direct) বা পরোক্ষ (Indirect) কোন নির্দেশ কুরআনে দেয়া হয় নাই। এই 'অন্য কাজের' মধ্যে কুরআন পড়া, পড়ানো, স্পর্শ করাসহ অন্য সকল কাজই অন্তর্ভুক্ত।

খ. বিভিন্ন ধরনের তথ্যের মাধ্যমে কুরআন পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না বা পাপ' কথাটি কুরআন বিরুদ্ধ কথা এবং 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে' কথাটি কুরআন সিদ্ধ কথা।

'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' কথাটার ব্যাপারে হাদীসের তথ্য

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, অজু বা গোসল করে পবিত্র না হয়ে কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ বা পাপ-এ ধরনের কোন কথা আল-কুরআনে নেই। তাই ঐ রকম কোন কথা যদি ইসলামে থেকেই থাকে তবে তা অবশ্যই হাদীসে থাকতে হবে। চলুন, এখন দেখা যাক এ বিষয়ে হাদীসে কী কী বক্তব্য আছে।

তথ্য-১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَوةِ.

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূল (সা.) শৌচাগার হতে বের হয়ে আসলে তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হল। তখন লোকেরা বলল, আমরা কি আপনার জন্যে অজুর পানি আনব না? তিনি বললেন, যখন নামাজের প্রস্তুতি নিব শুধু তখন অজু করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

তথ্য-২

ইবনে মাজাহ উপরোক্ত হাদীসটির ন্যায় একই রকম বর্ণনাসম্বলিত আর একটি হাদীস আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস দু'খানির সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস দুখানির ব্যাখ্যা বুঝার জন্যে তিনটি বিষয় আগে ভালো করে বুঝে নিতে হবে। যথা-

ক. হাদীস দুটোয় রাসূল (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন, 'তাঁকে শুধু নামাজ পড়ার আগে অজু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' সমগ্র কুরআন পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, তথায় নামাজ পড়ার আগে অজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়ার জন্যে দুটো সূরার মাধ্যমে (নিসা ও মায়েদা) সরাসরি ও বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য কোন কাজ করার আগে অজু বা গোসল করতে হবে এমন কোন কথা আল-কুরআনে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করা হয় নাই। অর্থাৎ হাদীস দুটোর বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ। তাই

হাদীস দুটোর বক্তব্য প্রায় কুরআনের বক্তব্যের ন্যায় শক্তিশালী এবং বিষয়ে অন্য কোন হাদীস এ হাদীস দুটোর থেকে বেশি শক্তিশালী হতে পারে না। কারণ, তা হতে হলে সেই হাদীসকে কুরআনের থেকেও বেশি শক্তিশালী হতে হবে, যা কখনই হতে পারে না।

খ. হাদীস দুটোতে রাসূল (সা.) অজু কথাটা সুনির্দিষ্টভাবে (Specifically) উল্লেখ করেছেন। গোসলের কথাটি তিনি এখানে উল্লেখ করেননি।

গ. হাদীস দুটো দু'জন বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) সরাসরি রাসূল (সা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং তা চারটি হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আবু হুরায়রা (রা.) হচ্ছেন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী।

হাদীস দুখানির ব্যাপারে উপরের তথ্যগুলো সামনে রেখে চলুন এখন তার বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করা যাক। খাওয়ার আগে অজু করা লাগে ভেবে, শৌচাগার হতে বের হয়ে রাসূল (সা.) খেতে বসতে গেলে অজুর পানি আনবে কিনা এ প্রশ্নটি সাহাবায়ে কিরামগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামগণের ঐ প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সহজেই বলতে পারতেন, 'খাওয়ার আগে অজু করার দরকার নেই।' কিন্তু তা না বলে তিনি বললেন, 'তিনি নামাজ পড়ার আগে অজু করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছেন।' অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট করে বলে দিলেন কুরআনের মাধ্যমে তাঁকে শুধু নামাজ পড়ার আগে অজু কথা জানানো হয়েছে। অন্য কোন কাজ করার আগে অজু করার কথা জানানো হয় নাই। এই অন্য কাজের মধ্যে যেমন পড়বে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য। তেমনি তার মধ্যে পড়বে রোজা থাকা, জিকির করা, দোয়া করা, কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থ দেখে বা মুখস্থ পড়া বা পড়ানো, কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি।

তাহলে পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত অর্থাৎ প্রায় কুরআনের আয়াতের ন্যায় শক্তিশালী এই হাদীস দুটোর বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়-

ক. কুরআন দেখে বা মুখস্থ পড়া বা পড়ানোর জন্যে অজুর প্রয়োজন নেই।

খ. কুরআন স্পর্শ করার জন্যেও অজু করার দরকার নেই।

গ. কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার আগে (গোসল ফরজ অবস্থায়) গোসল করতে হবে কিনা এখানে সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই।

চলুন, এবার দেখা যাক অন্য হাদীসে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কী কী বক্তব্য আছে-

তথ্য-৩

এ হাদীসটির পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অংশই শুধু উল্লেখ করা হলো:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ(رض) أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ (قَالَ) فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ...

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর খালা, রাসূলের (সা.) স্ত্রী, মায়মুনার (রা.)-এর ঘরে এক রাত কাটান। তিনি বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি এবং রাসূল (সা.) ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি শুইলেন। রাসূল (সা.) অর্ধ রাত বা তার কিছু কম-বেশি সময় ঘুমালেন। তারপর তিনি ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে চোখ মুখ মলতে মলতে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত মশকের নিকট গিয়ে উত্তমরূপে অজু করলেন। এরপর নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমিও উঠে গিয়ে তাঁর মত করলাম। তারপর তাঁর (বাম) পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম।.... (বুখারী)

ব্যাখ্যা: বর্তমান হাদীসখানি এবং পরে আসা হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা করা ও বোঝার সময় মনে রাখতে হবে ইসলামের বক্তব্য জানা ও বোঝার জন্যে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। পুস্তিকার তথ্যের উৎস বিভাগে ঐ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আর তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

আলোচ্য হাদীসখানির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় বিনা অজুতে কুরআন পড়া ইসলাম সিদ্ধ। কারণ, রাসূল (সা.) নিজে বিনা অজুতে কুরআন পড়েছেন এবং হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে বিনা অজুতে কুরআন পড়তে তিনি নিষেধ করেননি। আর যেহেতু পড়া কাজটি স্পর্শ করা কাজটির চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু উল্লিখিত হাদীসখানির তথ্য ও বিবেক-বুদ্ধির রায়ের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য মেলালে সহজে বলা যায়, বে-অজু কুরআন পড়া যখন ইসলামে সিদ্ধ তখন বে-অজু কুরআন স্পর্শ করাও ইসলাম সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না এটি সুন্নাহ তথা ইসলাম বিরুদ্ধ কথা।

তথ্য-৪

عَنْ عَلِيٍّ (رض)قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ الْقُرْآنَ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

অর্থ: আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) পায়খানা হতে বের হয়ে বিনা অজুতে আমাদের কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সঙ্গে গোশত খেতেন। তাঁকে কুরআন হতে বাধা দিতে পারত না বা বিরত রাখত না জানাবাত (গোসল ফরজ হয় এমন অবস্থা) ব্যতীত অন্য কিছু।

(আবু দাউদ, নাছায়ী ও ইবনে মাজাহ্)

দারাকুতনী, মুস্তাদারাকে হাকেম ও আল ইস্তিযকার গ্রন্থে হাদীসটির 'কুরআন হতে বিরত রাখত না' কথাটার স্থানে 'কুরআন তিলাওয়াত বা পড়া (تِلَاوَةٌ/ قِرَاءَةٌ) হতে বিরত রাখত না' কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: 'জানাবাত ব্যতীত অন্য কিছু' কথাটার অর্থ হয় অপবিত্রতার অন্য অবস্থা অর্থাৎ বে-অজু অবস্থা।

হাদীসখানি থেকে তাই স্পষ্ট জানা ও বুঝা যায়, গোসল ফরজ অবস্থায় রাসূল কুরআন পড়তেন বা পড়াতেন না। কিন্তু বে-অজু অবস্থায় রাসূল (সা.) তা করতেন।

অর্থাৎ এ হাদীসখানির আলোকে বলা যায়-

- ❑ গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া ও পড়ানো নিষেধ।
- ❑ বে-অজু অবস্থায় কুরআন পড়া ও পড়ানো সিদ্ধ। এটি ১, ২ ও ৩ নং তথ্যের হাদীস তিনটিরও বক্তব্য।

ইসলামী জীবন বিধানে যে কাজ করা নিষিদ্ধ তার সহায়তাকারী সকল কাজও নিষিদ্ধ। যেমন: মদ খাওয়া নিষিদ্ধ-তাই মদ উৎপাদন, বেচা, কেনা ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। সুদ নিষিদ্ধ-তাই সুদ দেয়া, নেয়া, সুদের সাক্ষী হওয়া ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। এ তথ্যের আলোকে আলোচ্য হাদীসখানির বক্তব্য থেকে তাহলে সহজেই বলা ও বুঝা যায়, যেহেতু গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া বা পড়ানো নিষিদ্ধ, সেহেতু ঐ অবস্থায় কুরআন ধরতে পারাও নিষিদ্ধ হবে। কারণ, অধিকাংশ মানুষের মুখস্থ না থাকায় কুরআন ধরে পড়তে হয়। অর্থাৎ ধরা কাজটি কুরআন পড়া কাজটিতে ভীষণভাবে সহায়তা করে। সুতরাং হাদীসখানির সাথে বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব প্রদানকারী হাদীসসমূহ ও উপরোল্লিখিত ইসলামের কোন বিষয় নিষিদ্ধ হওয়ার সাধারণ নীতিমালা মেলালে যে তথ্য বের হয়ে আসে, তা হচ্ছে-

- ❑ গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা সবই নিষিদ্ধ।
- ❑ বে-অজু অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা সবই সিদ্ধ।

তথ্য-৫

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

অর্থ: আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানা থেকে বুঝা যায়, গোসল ফরজ অবস্থায় আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.) এর মুখ থেকে কুরআন পড়া শুনেছেন এবং রাসূল (সা.) তা নিষেধ করেননি। সুতরাং এ হাদীসখানি থেকে সহজে বলা ও বুঝা যায় গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন শুনা নিষেধ নয়।

তথ্য-৬

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ঋতুবতী মহিলা এবং গোসল ফরজ অবস্থায় কোন ব্যক্তি কুরআনের কিছুই পড়বে না। (তিরমিজী)

ব্যাখ্যাঃ ৪ নং তথ্যের হাদীসখানির ব্যাখ্যার ন্যায় এ হাদীসখানির ব্যাখ্যা থেকেও তাহলে বলা ও বুঝা যায়-গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা নিষেধ।

তথ্য-৭

বুখারী শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) রোমের বাদশাহ্ কাইজার হেরাক্লিয়াসকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে কুরআন মজিদের এ আয়াতটিও লেখা ছিল-

تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ.

হেরাক্লিয়াসকে চিঠিটা ধরে পড়ার জন্যে রাসূল (সা.) দিয়েছিলেন। অন্যান্য কাফের বা মুশরেক নেতার কাছেও রাসূল (সা.) কুরআনের আয়াত লেখা চিঠি দিয়েছেন। তাই রাসূলের (সা.) এ সুন্নাহ থেকে বুঝা যায়, কাফের বা মুশরিকদের অর্থাৎ মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র ব্যক্তিদের কুরআন স্পর্শ করা এবং পড়া নিষেধ নয়। নিম্নের বিষয়গুলো থেকেও এ বক্তব্যটার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

- ইসলামের আক্বীদাগত (বিশ্বাসগত) এবং ব্যক্তিগত বিধান শুধু মুমিনদের জন্যে প্রযোজ্য, কাফের বা মুশরিকদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। তবে সামাজিক বিষয়গুলো সকল মানুষের জন্যে প্রযোজ্য। আর তাই ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলিম নামাজ না পড়লে বা রোজা না থাকলে তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে কিন্তু কাফের বা মুশরেককে ঐ কারণে শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু চুরি করলে কাফের, মুশরেক ও মুসলিম সবাইকে শাস্তি দেয়া যাবে।
- কুরআন স্পর্শের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআনকে সম্মান দেখানো। যে ব্যক্তি কুরআনকে বিশ্বাসই

করে না (কাফের ও মুশরিক তথা মানসিক অপবিত্র ব্যক্তি) তাকে কুরআনকে সম্মান দেখাতে বলা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়।

- আল-কুরআনের অনেক জায়গায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কুরআন সকল (কাফের, মুশরেক, ঈমানদার) মানুষের জন্যে। আল-কুরআনে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তা বুঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে নানা ধরনের উদাহরণ ও কাহিনী বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম কী এবং কেন তা অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ, যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর, তা কুরআনে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই অমুসলিমরা যদি কুরআন ধরে পড়তে না পারে, তবে তারা তো জানতেই পারবে না ইসলাম কী এবং কেন এটি তাদের পালনকৃত জীবন ব্যবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ, যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণের দিকে অগ্রসরই হতে পারবে না। আর ইসলাম সরাসরি কুরআন তথা আল্লাহর নিকট থেকে জানা, আর অন্য মানুষ (নবী-রাসূল বাদে) বা অন্য গ্রন্থের থেকে জানার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সুতরাং অমুসলিমদের শারীরিক অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করার অর্থ হচ্ছে তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। তাই এমন বিধি-নিষেধ ইসলামে না থাকারই কথা।

তথ্য-৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহের (সা.) সাক্ষাৎ হলো। আমি তখন বীর্যপাতের দরুন নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সহিত চলতে থাকলাম যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং ঠিকানায় এসে

গোসল করলাম। এরপর আবার ও তাঁর নিকট গেলাম। তখনও তিনি তথায় বসে ছিলেন। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে আবু হুরায়রা? আমি তাঁকে ব্যাপারটা বললাম। তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, সুবহানাল্লাহ! মুমিন নাপাক বা অপবিত্র (নাজাস) হয় না।(বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ যুনুবি অর্থাৎ ফরজ গোসল অবস্থার দরুন অপবিত্র থাকার জন্যে আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.)-এর শরীর স্পর্শ করতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাই তিনি সুযোগ মতো সরে পড়ে গোসল করে আসেন। কারণ, তিনি জানতেন যুনুবি অবস্থায় গোসল না করলে পাক বা পবিত্র হওয়া যায় না। ব্যাপারটা জানতে পেরে রাসূল (সা.) বললেন, মুমিন নাপাক বা অপবিত্র (নাজাস) হয় না। মুমিন শারীরিক দিক দিয়ে অবশ্যই অপবিত্র হয়। তাই রাসূল (সা.) এখানে বলেছেন, মুমিন মানসিক অর্থাৎ বিশ্বাসগত দিক দিয়ে অপবিত্র হয় না। রাসূল (সা.)-এর এ কথাটি আল-কুরআনের সূরা তওবার ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বলা চলে। সেখানে আল্লাহ বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ

অর্থঃ মুশরেক লোকেরা নাপাক বা অপবিত্র।

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন মুশরেকরা মানসিক দিক দিয়ে সকল সময় অপবিত্র।

তাই এ হাদীস এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, মুমিন যেমন শারীরিক অপবিত্রতার দরুন মানসিক বা আক্বিদাগত দিক দিয়ে অপবিত্র হয় না, তেমনই মুশরেক বা কাফের অজু বা গোসল করলেও শারীরিক দিক দিয়ে পবিত্র হয় না।

এ পর্যন্তকার উল্লিখিত হাদীসগুলোর তথ্যের সার-সংক্ষেপ

- ❑ অজু ছাড়া কুরআন পড়া, পড়ানো, শোনা ও স্পর্শ করা সব কিছুই জায়েয বা সিদ্ধ।
- ❑ গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা নাযায়েজ বা নিষিদ্ধ কিন্তু শোনা সিদ্ধ।
- ❑ কাফের-মুশরেকদের ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন পড়া, শোনা বা স্পর্শ করার ব্যাপারে অজু-গোসল কোন শর্ত নয়।

'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ' কথাটির দলিল বলে বর্ণিত হাদীসটি ও তার পর্যালোচনা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাজম বলেন, রাসূল (সা.) আমর ইবনে হাজমের (রা.) নিকট যে সব লিখিত বিধি-বিধান পাঠিয়েছিলেন তাতে একটি হুকুম এই ছিল যে, 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।' (মুয়াত্তা)

আবি দাউদ মুরসাল হাদীস হিসেবে উপরের হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'ইমাম জুহরী বলেন, তিনি, ইবনে আবুবকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাজমের নিকট রাসূলে করীম (সা.)-এর যে লিখিত ফরমান দেখেছিলেন, তাতে এ হুকুমটিও ছিলো- لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।'

ব্যাখ্যাঃ এটিই হচ্ছে সেই হাদীস যেটি বর্তমান মুসলিম সমাজে 'বে-অজু কুরআন স্পর্শ করা হারাম, নাযায়েজ বা মহাপাপ'। কথাটি চালু হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। আর তা মুসলিমদের কুরআন অধ্যয়নের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। তাই হাদীসটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। আর সেই ব্যাখ্যার মাধ্যমে যদি প্রতীয়মান হয় হাদীসটিকে ব্যাখ্যা করে ঐ রকম কথা কোনভাবেই বলা যায় না, তবে সে তথ্যটাও বর্তমান মুসলিম জাতিকে ব্যাপকভাবে জানতে হবে।

হাদীসটিকে ব্যাখ্যা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে যে চিরসত্য কথাগুলো আগে জানতে ও বুঝতে হবে, তা হচ্ছে-

- ❑ কোন নির্ভুল হাদীসের বক্তব্য ব্যাখ্যা কুরআনের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্যের বিপরীত অবশ্যই হতে পারে না বা পারবে না।
- ❑ হাদীস থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে ঐ বিষয়ের সকল সহীহ হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

- ❑ শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য কম শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্যের থেকে অগ্রাধিকার পাবে।
- ❑ সুনির্দিষ্ট (Specific/خاص) বক্তব্যসম্বলিত হাদীস অনির্দিষ্ট (Non-Specife/عام) হাদীসের উপর অগ্রাধিকার পাবে।
- ❑ একটি হাদীসের বক্তব্য আর একটি হাদীসের বক্তব্যকে রহিত করতে পারে তবে রহিতকারী হাদীসটিকে অবশ্যই রহিত হওয়া হাদীসটি অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী হতে হবে।
- ❑ মুরসাল হাদীস (যে হাদীসে বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাহাবীর নাম নেই) দ্বারা ইসলামের কোন বিধান নির্ণয় করা সাধারণভাবে নিষেধ।

চলুন প্রথমে দেখা যাক হাদীসটি 'মুরসাল' না 'সহীহ'। আলোচ্য হাদীসটি দুইজন মনীষী তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের একজন, ইমাম মালেক (রহ.) হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন। আর দ্বিতীয়জন আবি দাউদ (রহ.) হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। মুরসাল হাদীস হচ্ছে সেই হাদীস, যে হাদীসে রাবিদের (বর্ণনাকারীদের) মধ্যে সাহাবীর নাম নেই। অর্থাৎ তাবেয়ী সরাসরি রাসূল (সা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কোন তাবেয়ীর সঙ্গে রাসূলের (সা.) দেখা হয়নি। তাই, রাসূল (সা.) উদ্ধৃতি দিয়ে তাবেয়ীর বলা কোন কথা আসলে রাসূল (সা.) এর কথা কিনা এ ব্যাপারে বিরাট সন্দেহ থেকে যায়। এ জন্যে ইসলামী শরীয়াতে সত্যিকারভাবে মুরসাল হাদীস দিয়ে কোন বিধান বানানো নিষেধ।

তবে কোন কোন তাবেয়ী কিছু হাদীস বর্ণনা করার সময় সাহাবীর (রা.) নাম উল্লেখ করেননি এটা ভেবে যে, হাদীসটি এবং তার বর্ণনাকারী সাহাবী এত প্রসিদ্ধ যে, তাঁর (সাহাবীর) নাম উল্লেখ না করলেও হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। তাই কোন মুরসাল হাদীসকে বিধান বানানোর মর্যাদা থেকে বাদ দিতে হলে প্রথমে সঠিকভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, হাদীসটি 'সত্যিকারভাবে মুরসাল'।

হাদীসটির ব্যাপারে বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, 'যদিও এ রেওয়ায়েতটির বহু সনদ রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটির বিষয়েই চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।' ইবনে কাসীর (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, হাদীসটির সবগুলো বর্ণনাই সন্দেহজনক। আর 'এ

ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন' কথাটি বলা হয় ঐ সকল হাদীসের ব্যাপারে যেখানে রাসূল (সা.) প্রকৃতভাবে কী বুঝিয়েছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না যায়।

এখন চলুন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে দেখা যাক, হাদীসটি 'মুরসাল' হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, না সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

দৃষ্টিকোণ-১

❑ রাসূল (সা.)-এর ইসলামের বিধান জানানোর সাধারণ নিয়মের দৃষ্টিকোণ

ইসলামের কোন বিধান জানানোর ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর সাধারণ নিয়ম ছিলো, সাহাবায়ে কিরামদের জমায়েতে তা ঘোষণা করা যেন বেশি সংখ্যক সাহাবী সে বিধান সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সাহাবায়ে কিরামদের অধিক বড় জমায়েতে রাসূল (সা.) উপস্থাপন করতেন।

যে দুটো গ্রন্থে আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, সে উভয়ে গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে রাসূল (সা.) এ বাণীটি জানিয়েছেন, আমর বিন হাজম (রা.) এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে। প্রশ্ন হচ্ছে, একটা বিধান যা কুরআন ও সুন্নাহে ঘোষিত মুসলিমদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমলটি পালন করার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং যা তার বর্ণনা করা অন্যান্য বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী, তা তিনি সাহাবায়ে কিরামদের জমায়েতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা না করে একজন সাহাবীর নিকট লেখা একটা চিঠির মাধ্যমে জানাবেন, এটা কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির বিচার-বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হতে পারে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সবাই বলবেন, তা অবশ্যই হতে পারে না। বরং রাসূল (স.) এর বিচার-বিবেচনার সঙ্গে এটাই সঙ্গতিশীল ছিল যে, এমন একটি কথা তিনি সাহাবায়ে কিরামদের বিরাট জমায়েতে ঘোষণা করবেন, যাতে অসংখ্য সাহাবী কথাটা সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনতে পায়। অর্থাৎ হাদীসটি মুতাওয়াতির সহীহ হওয়া উচিত ছিল। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ সাহাবীদের বর্ণনা না করার দৃষ্টিকোণ

হাদীসটির দুটো বর্ণনাতেই দেখা যায়, বিধানটি রাসূল (সা.) আমর বিন হাজম (রা.) এর নিকট চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) লিখতে পারতেন না। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি অন্য একজন সাহাবী দ্বারা চিঠিটা লিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ কমপক্ষে দুইজন সাহাবী (যিনি লিখেছিলেন এবং যার কাছে চিঠিটা লেখা হয়েছিল) অবশ্যই বক্তব্যটা জানতেন। আর যেহেতু বক্তব্যটা লেখা ছিলো তাই ঐ বক্তব্যকে রাসূল (স.)-এর বক্তব্য বা তাতে কোন কম-বেশি হয় নাই, সে ব্যাপারে ঐ দুজন সাহাবীর কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু হাদীসটির দুটো বর্ণনাতেই দেখা যাচ্ছে, হাদীসটি ঐ সাহাবী দু'জনের কেউই বর্ণনা করেননি, বরং তা বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ (র.) বা জহুরী (র.) নামের দু'জন তাবে তাবেয়ীন। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামদের ৪ প্রজন্ম (Generation) পরের দুই মনীষী। এমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান যদি রাসূল (সা.) এর লেখা কোন চিঠিতে থাকত, তবে সেই চিঠি লেখা বা পড়া সত্ত্বেও দু'জন সাহাবীর কেউ তা প্রকাশ করলেন না এটা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এরকম একটি বিধান রাসূল (সা.) এর ঐ চিঠিতে লেখা ছিল কিনা সে ব্যাপারে এক বিরাট প্রশ্ন অবশ্যই এসে যায়।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ যে কথা কুরআনের কোন তথ্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী, তা রাসূল (সা.) এর বলা না বলার দৃষ্টিকোণ

যে কথা কুরআন ঘোষিত মুসলিমদের ১ নং আমলের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং মহান আল্লাহ তা আল-কুরআনে উল্লেখ করেননি তেমন কথা রাসূল (সা.) বলতে পারেন না।

এ হাদীসটির বক্তব্য কুরআন ঘোষিত মুসলিমদের ১ নং আমলের পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা এবং কুরআনে আল্লাহ এ রকম কোন বক্তব্য রাখেননি। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাই এ হাদীসটি মুরসাল হবে।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ নিজ বলা অন্য কথার বিপরীত বক্তব্য রাসূল (সা.) এর বলা না বলার দৃষ্টিকোণ

অনির্দিষ্ট (Non-Specific) হওয়ার জন্যে আলোচ্য হাদীসটি বিশ্লেষণ করে তিনটি বিধান বের করা সম্ভব। যথা-

ক. বে-অজু কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ,

খ. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ এবং

গ. কাফের-মুশরেকদের কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ।

এই তিনটি বিধানের দুটোর (ক এবং গ নং) বিপরীত বক্তব্য বর্ণনাকারী হাদীস আছে (আগে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সেই হাদীসগুলো বর্তমান হাদীসটির থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। যে কথার বেশির ভাগ অংশ নিজের বলা অধিক শক্তিশালী কোন কথাসমূহের বিপরীত তেমন কোন কথা রাসূল (সা.)-এর না বলারই কথা। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আলোচ্য হাদীসটির মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ অধিকাংশ সাহাবীর সমর্থন না থাকার দৃষ্টিকোণ

মুফতি শফী (র.)-এর তাফসীর গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) আল-কুরআনের সূরা ওয়াকিয়ার যে আয়াতটিকে কিছু কিছু তাফসীরকারক অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে দলিল মনে করেন, সে আয়াতের ব্যাপারে, বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের মত হচ্ছে, ঐ আয়াতটির বক্তব্য ফেরেশতাদের জন্যে, মানুষের জন্যে নয়। ঐ কিছু কিছু তাফসীরকারক ঐ আয়াতটির যে তরজমা এবং ব্যাখ্যা করেছেন, আলোচ্য হাদীসটির বক্তব্যও প্রায় তদ্রূপ। তাই আলোচ্য হাদীসটির বক্তব্যকে সমর্থনকারী সাহাবীর সংখ্যা অনেক কম বা শূন্য হওয়ার কথা। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও হাদীসটি মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সুধী পাঠক, মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক যদি সঠিক থাকে তবে অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় এবং রাসূলের (সা.) মুজেজা ছাড়া ইসলামে এমন কোন বিষয় নেই, যা চিরন্তনভাবে সে বিবেকের বাইরে বা বিরুদ্ধ হবে। যে হাদীসটি এতগুলো দৃষ্টিকোণ থেকে মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সে হাদীসটির দ্বারা মুসলিমদের ১নং আমলের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন বিধান তৈরি করা কোনভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? আপনাদের বিবেক কী বলে? আমার বিশ্বাস, আপনাদের সবার বিবেক বলবে, অবশ্যই হতে পারে না।

চলুন এখন দেখা যাক, তর্কের খাতিরে হাদীসটিকে যদি নির্ভুলও ধরা হয় তবে তার বক্তব্যকে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করার

ব্যাপারে কুরআন, অন্যান্য সহীহ হাদীস এবং বিবেকের তথ্যগুলোর পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে যে তথ্যগুলো বের হয়, তার কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে আর কোনটি হবে না এবং কেন তা হবে বা হবে না।

এ পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে-

ক. ইসলামে অপবিত্রতা তিন ধরনের যথা-

১. মানসিক অপবিত্রতা,

২. অজু করলে পবিত্র হয় এমন শারীরিক অপবিত্রতা এবং

৩. গোসল করলে পবিত্র হয় এমন শারীরিক অপবিত্রতা।

খ. বর্তমান হাদীসটি পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে অনির্দিষ্ট (Non-Specific বা عام)। কারণ, হাদীসটিতে অপবিত্র লোকদের কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কোন্ ধরনের অপবিত্র লোক তা নির্দিষ্ট করে বলা হয় নাই।

১. বে-অজু কুরআন দেখে বা মুখস্থ পড়া বা পড়ানো যাবে

- ❑ বিধানটির পক্ষে কুরআনের পরোক্ষ বক্তব্য আছে,
- ❑ ২ ও ৩ নং তথ্যের হাদীস দু'খানি প্রত্যক্ষভাবে বিধানটির পক্ষে,
- ❑ ১ নং তথ্যের হাদীস দুটো বিধানটির পক্ষে এবং সেখানে অজু কথাটি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,
- ❑ আলোচ্য হাদীসটি বা অন্য কোন হাদীস এ বক্তব্যের বিরুদ্ধ নয়।

✪✪ সুতরাং বিধানটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে।

২. বে-অজু কুরআন স্পর্শ করা যাবে না

- ❑ কুরআনে এ বিধানটির পক্ষে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা ইঙ্গিতেও কোন বক্তব্য নেই,
- ❑ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী পরোক্ষভাবে কুরআন বিরুদ্ধ,
- ❑ ১ নং তথ্যের হাদীস দুটোর বিরুদ্ধ। আর ঐ হাদীস দুটো প্রায় কুরআনের আয়াতের সমান শক্তিশালী। সেখানে কুরআন স্পর্শ করা কথাটি পরোক্ষভাবে আসলেও অজু কথাটি প্রত্যক্ষভাবে এসেছে।

❑ বর্তমান হাদীসটি বিধানটিকে সমর্থন করে। কিন্তু এ হাদীসটি ১ নং তথ্যের হাদীস দুটো থেকে নিম্নের দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক অনেক কম শক্তিশালী-

ক. ১ নং তথ্যের হাদীস দুটোর বক্তব্য কুরআনের তথ্যের অনুরূপ। কিন্তু বর্তমান হাদীসটির বক্তব্যের ব্যাপারে কুরআনের কোন সমর্থন তো নেই বরং তা কুরআনের পরোক্ষ বক্তব্যের বিরোধী।

খ. বর্তমান হাদীসটি পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে অনির্দিষ্ট। কারণ সেখানে অপবিত্রতার কোন্ অবস্থায় বে-অজু (বে-গোসল, না মানসিক অপবিত্রতা) কুরআন স্পর্শ করা যাবে না, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

❖❖ তাই এ বিধানটি কোনভাবেই ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৩. বে-অজু কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না

❑ সম্পূর্ণ বিবেক-বিরুদ্ধ,

❑ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী পরোক্ষভাবে কুরআন বিরুদ্ধ,

❑ 'বে-অজু কুরআন স্পর্শ করা যাবে না' কথাটা বর্তমান হাদীস সিদ্ধ কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত অনেক শক্তিশালী হাদীস বিরুদ্ধ।

✪✪ তাই কুরআন, হাদীস ও বিবেক অনুযায়ী এ কথাটাও কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৪. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা যাবে না

❑ বিবেক-সিদ্ধ। কারণ-

ক. স্পর্শ করা না গেলে পড়তে না পারাও যুক্তিসঙ্গত। আবার পড়া নিষেধের সাথে সাথে স্পর্শ করাও নিষেধ থাকলে পড়ার নিষেদাজ্ঞাটা বেশি কার্যকরী হয়।

খ. অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শের ব্যাপারে অন্য গ্রন্থের থেকে কুরআনের বিশেষত্ব থাকে। কারণ অন্য সকল গ্রন্থ গোসল ফরজ অবস্থায় ধরা যায়। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা মুসলিমদের বেশিক্ষণ কুরআন থেকে দূরে রাখতে পারে না। কারণ, মুসলিমরা গোসল ফরজ অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকে না। পরবর্তী নামাজের আগে তাদের অবশ্যই গোসল করতে হয়,

- ❑ কুরআন বিরুদ্ধ নয়। কারণ, কুরআনে এর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন বক্তব্য নেই,
- ❑ ৪ ও ৬ নাম্বারের হাদীস তিনটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর পক্ষে,
- ❑ বর্তমান হাদীসটিও এর পক্ষে। কারণ, 'অপবিত্র' কথাটার মধ্যে গোসল ফরজ অবস্থাটাও অন্তর্ভুক্ত। তবে কথাটা এখানে অনির্দিষ্ট

❖❖ তাই এ বিধানটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে।

৫. মানসিক অপবিত্ররা (কাফের-মুশরেকরা) কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না

- ❑ বিবেক-বিরুদ্ধ। কারণ-
  - ক. যারা কুরআন মানেই না (কাফের-মুশরেক) তাদের কুরআনকে সম্মান দেখাতে বলা অর্থহীন,
  - খ. কাফের-মুশরেকরা অজু গোসল করলেও শারীরিক দিক দিয়ে পবিত্র হয় না।
- ❑ পরোক্ষভাবে আল-কুরআনের বিরুদ্ধ। কারণ, আল কুরআনে বলা হয়েছে কুরআন হচ্ছে সকল মানুষের জীবন পরিচালনা হেদায়েত, গাইড লাইন বা ম্যানুয়াল। আর ইসলামের ব্যক্তি জীবনের বিধান অমুসলিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।
- ❑ ৭ নং তথ্যের হাদীসটির প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ,
- ❑ বর্তমান হাদীসটি এর পক্ষে হলেও হাদীসটি বক্তব্য অনির্দিষ্ট অর্থাৎ হাদীসটি ৬ নং তথ্যের হাদীসটি থেকে দুর্বল।

✪✪ তাই এ বিধানটিও কুরআন হাদীস ও বিবেকের তথ্য অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে কুরআন স্পর্শের ব্যাপারে শিক্ষা

এই ঘটনাটা অনেকেই 'বে-অজু কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ' কথাটার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তাই ঘটনাটা নিয়েও একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার। আর সে আলোচনা থেকে সহজে বুঝা যাবে ঘটনাটা 'বে-অজু কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ'-এই কথাটার বিপক্ষে না পক্ষে।

ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করার আগে যে তথ্যগুলো আগে জানা দরকার তা হচ্ছে-

- ঘটনাটি কোন হাদীস নয়, একটা ঘটনামাত্র।
- ইসলামের সকল বিধানের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং বিবেক-বুদ্ধি।
- কোন ঘটনা বা তার ব্যাখ্যা যদি কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের কোন বক্তব্যের বিরোধী হয়, তবে সে ঘটনার ইসলামে কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ কোন ঘটনা বা তার ব্যাখ্যা ইসলামে শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা কুরআন এবং নির্ভুল হাদীসের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয়।

তাই হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যাখ্যা করে যদি অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারে কোন তথ্য বের করা হয় এবং তা যদি ইসলামী জীবন বিধানে গ্রহণযোগ্য হতে হয়, তবে সে তথ্যকে অবশ্যই কুরআন ও নির্ভুল হাদীসের ঐ বিষয়ের তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

সীরাতে ইবনে হিশামে হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখান থেকে পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অংশটুকু হুবহু রেখে ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে প্রথমে উল্লেখ করছি।

মক্কার কাফেরদের সঙ্গে পরামর্শ করে ওমর রাসূল (স.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে খোলা তরবারী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। পথে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাই প্রথমে বোন-ভগ্নিপতিকে হত্যা করার জন্যে ওমর তাদের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। হযরত খাব্বাব (রা.) তখন ওমরের ভগ্নি ফাতেমা (রা.) ও তাঁর স্বামীকে সূরা ত্বহার অংশবিশেষ পড়ে পড়ে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

ওমরের আগমন টের পেয়ে খাব্বাব (রা.) অন্য একটা কক্ষে লুকান এবং ফাতেমা (রা.) কুরআনের আয়াত লেখা জিনিসটি লুকিয়ে ফেলেন। ওমর গৃহে প্রবেশের সময় শুনেছিলেন, খাব্বাব (রা.) কুরআন পড়ে তাদের দু'জনকে শুনাচ্ছেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, 'তোমরা কী যেন পড়ছিলে শুনলাম'। সাইদ (রা.) (ভগ্নিপতি) ও ফাতেমা (রা.) উভয়েই বললেন, 'তুমি কিছুই শোননি'। ওমর বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি শুনেছি তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছ এবং তা অনুসরণ করে চলেছ'। এ কথা বলেই ওমর ভগ্নিপতি সাইদকে (রা.) একটা চড় বসিয়ে

দিলেন। ফাতিমা (রা.) তাঁর স্বামীকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে গেলে, ওমর ফাতেমা (রা.) কে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তিনি আহত হলেন। ওমরের এই বেপরোয়া আচরণ দেখে তারা উভয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা খুশি করতে পারেন'। ওমর (রা.) নিজের বোনের গায়ে রক্ত দেখে অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর অনুশোচনার সুরে বোনকে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা যে বইটা পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাওতো। আমি একটু পড়ে দেখি, মুহাম্মাদ কী বাণী প্রচার করে?' ফাতেমা (রা.) তখন বললেন, 'আমার আশঙ্কা হয় বইটা দিলে আপনি তা নষ্ট করে ফেলবেন।' উত্তরে ওমর দেবদেবীর শপথ করে বললেন, 'তুমি ভয় পেয়ো না, আমি পড়ে অবশ্যই তা ফিরিয়ে দেব।' এ কথা শুনে বোনের মনে আশার সঞ্চার হলো যে, তিনি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন। তাই তিনি বললেন, 'ভাইজান আপনি মুশরেক হওয়ার কারণে অপবিত্র। অথচ এই বই স্পর্শ করতে হলে পবিত্রতা অর্জন করা প্রয়োজন।'

ওমর তৎক্ষণাৎ গোসল করে পবিত্র হয়ে আসলেন। ফাতেমা (রা.) তখন কুরআনের আয়াত জিনিসটি তাঁর হাতে দিলেন। খুলেই যে অংশটি পেলেন তা হচ্ছে সূরা 'ত্বহা'। প্রথম থেকে কিছুটা পড়েই বললেন, 'কী সুন্দর কথা! কী মহান বাণী!' আড়াল থেকে এ কথা শুনে খাব্বাব (রা.) বের হয়ে এসে বললেন, ওমর ,আমার মনে হয় আল্লাহ তাঁর নবীর দোয়া কবুল করে তোমাকে ইসলামের জন্যে মনোনীত করেছেন। গতকাল তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি কর। হে ওমর, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও!'

ওমর তখন বললেন, 'হে খাব্বাব, আমাকে মুহাম্মাদের সন্ধান দাও। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করি।' এর পর ওমর (রা.) রাসূল (সা.) এর অবস্থান জেনে নিয়ে সেখানে গিয়ে কালেমা তাইয়্যেবা মুখে পড়ে অর্থাৎ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা.) কালেমা তাইয়্যেবা পড়ানোর আগে তাঁকে আর গোসল বা অজু কোনটাই করাননি।

ঘটনাটির ব্যাখ্যা

ঘটনাটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে যে বিষয়গুলো সহজে বুঝা যায় তা হচ্ছে- রাগান্বিত ওমর কুরআনের আয়াত লেখা কাগজটি পড়তে চাইলে তাঁর বোন ফাতেমা (রা.) তা দিতে অস্বীকার না করে বললেন, 'আমার ভয় হয়, লেখাটি দিলে আপনি তা নষ্ট করে ফেলবেন অর্থাৎ কুরআনের আয়াতকে অপমান করবেন।' ফাতেমা (রা.) এর, কাফের ওমরকে কুরআন দিতে অস্বীকার না করে এরকম বলার কারণ হচ্ছে, তাঁর জানা ছিল যে-

- ❑ রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী অমুসলিমরা আগ্রহসহকারে পড়তে চাইলে কুরআন তাদের হাতে উঠিয়ে দেয়া নিষেধ নয়। বরং এ কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত,
- ❑ যদি বুঝা যায় কোন অমুসলিম কুরআনকে অপমান করতে পারে, তবে তাকে কুরআন স্পর্শ করতে না দেয়া বা সে যাতে কুরআন স্পর্শ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা নেয়া সকল মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব,
- ❑ সুন্নাহ অনুযায়ী (৫ নং তথ্যের হাদীসটি) অজু-গোসল করলেও কাফের-মুশরেকদের শরীর পবিত্র হয় না এবং
- ❑ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফাতেমা (রা.) এর সন্দেহ হচ্ছিল, তাঁর রাগান্বিত ভাই হাতে পেলে কুরআনকে অপমান করতে পারে।

এ ঘটনায় বর্ণিত ফাতেমা (রা.) এর পরবর্তী সকল বক্তব্য বিশ্লেষণ করার সময় উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। চলুন, এখন ঘটনার পরবর্তী অংশটুকু বিশ্লেষণ করা যাক-

ফাতেমা (রা.) এর আশঙ্কা নিরসনের জন্যে ওমর যখন দেব-দেবীর দোহাই দিয়ে বললো, পড়ার পর সে কুরআনের আয়াত লেখা কাগজটি ফেরত দিবে, তখন ফাতেমা (রা.) কিছুটা আশ্বস্ত হলেও পুরোপুরি শংকামুক্ত হতে পারেননি। তাই পরবর্তীতে তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে ওমরের রাগ কমানো যায় বা বুঝা যায় তাঁর রাগ কমেছে।

এটা সবার জানা, রাগ কমানোর সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে সময়ক্ষেপণ। আর রাগ কমেছে কিনা তা বুঝার একটা উপায় হচ্ছে এটা দেখা যে, নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করা হচ্ছে কিনা।

আবার গোসল করলেও রাগ কমে। এ কারণেই ফাতেমা (রা.) তাঁর ভাইকে বলেছিলেন, 'আপনি মুশরেক হওয়ার জন্যে অপবিত্র, তাই কুরআন স্পর্শ করে পড়তে হলে আপনাকে গোসল করে আসতে হবে'। গোসল করা সময়ের ব্যাপার এবং তখন আরব দেশে গোসল করার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি পাওয়া কঠিন ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওমর বোনের কথা মাথা পেতে নিয়ে গোসল করে আসলেন। তারপর ফাতেমা (রা.) তাঁর হাতে কুরআনের আয়াত লেখা জিনিসটি ধরে পড়ার জন্যে তুলে দিলেন। উল্লেখ্য, ওমর তখনো কাফেরই ছিলেন।

ঘটনাটির শেষের দিকে কাফের ভাইকে বলা ফাতেমা (রা.) এর কথাগুলোর অর্থ যদি এটা ধরা হয় যে, ভাইকে গোসল করে আসতে বলার পিছনে কারণ ছিলো, রাগ কমানো নয় বা রাগ কমেছে কিনা তা যাচাই করা নয় বরং পবিত্রতা অর্জন করানো, তবে অবশ্যই বলতে হবে যে-

১. ফাতেমা (রা.) এর জানা ছিল না-
   - ❑ সুন্নাহ অনুযায়ী কাফের-মুশরেকরা অজু-গোসল করলেও শারীরিক পবিত্র হয় না।
   - ❑ কাফের-মুশরেকরা যদি আগ্রহসহকারে কুরআন ধরে পড়তে চায়, তবে সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে উৎসাহ প্রদান করতেই বলেছে কুরআন ও সুন্নাহ।

২. ফাতেমা (রা.) জেনে-শুনে রাসূল (স.) এর উপরোক্ত সুন্নাহকে অমান্য করেছে।

সুধী পাঠক, ফাতেমা (রা.) এর শেষের দিকের কথাগুলোর কারণ হিসেবে কোন বিষয়টি (রাগ কমানো, না পবিত্রতা অর্জন) বেশি যুক্তিসঙ্গত বা সুন্নাহের অনুসরণ হবে, আপনিই বলুন!

এরপরও যদি ধরা হয়, ফাতেমা (রা.) পবিত্রতা অর্জনের জন্যে ভাইকে গোসল করে আসতে বলেছিলেন, তবু এর মাধ্যমে এ কথা তো বলা যাবে না যে, কুরআন ধরতে অজু করা লাগবে। কারণ ফাতেমা (রা.) তাঁর ভাইকে অজু করে আসতে বলেননি, গোসল করে আসতে বলেছিলেন।

তাই অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা না করা সম্বন্ধীয় পূর্বোল্লেখিত হাদীসগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ ঘটনার ব্যাখ্যা থেকে যে তথ্যগুলো গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা হচ্ছে-

- ❑ কাফের-মুশরেকদের হাতে জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন তুলে দিতে নিষেধ নেই,
- ❑ যদি ভয় থাকে কোন কাফের বা মুশরেক কুরআনকে অপমান করতে পারে, তবে সে কুরআনকে অপমান করবে না-এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত, তার হাতে কুরআন তুলে দেয়া যাবে না।

আলোচ্য বিষয়ে কুরআন, হাদীস, বিবেক-বুদ্ধি ও ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে বের হয়ে আসা চূড়ান্ত রায়

১. মুসলিমের জন্যে অজু ছাড়া কুরআন পড়া, পড়ানো, স্পর্শ করা ও শোনা কোনটিই নিষেধ বা গুনাহ নয়,

২. গোসল ফরজ অবস্থায় মুসলিমের জন্যে কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা নিষেধ কিন্তু শোনা নিষেধ নয়,

৩. সকল সময় অজু অবস্থায় থাকা একটি মুস্তাহাব কাজ। তাই অজুসহ কুরআন পড়লে, পড়ালে বা স্পর্শ করলে, অজুর সওয়াব যোগ হওয়ার জন্যে সওয়াব বেশি হবে,

৪. ইচ্ছা করছে সময়ও আছে কিন্তু অজু না থাকার জন্যে কুরআন ধরে না পড়লে, টুপি না থাকার জন্যে নামাজ না পড়লে যেমন গুনাহ হয় তেমন গুনাহ হবে,

৫. কাফের-মুশরেকদের ব্যাপারে জানার জন্যে কুরআন ধরে পড়ার বিষয়ে অজু বা গোসলের শর্ত নাই,

৬. কোন কাফের ভক্তিসহকারে কুরআন পড়তে চাইলে সকল মুসলিমের আগ্রহসহকারে কুরআন তার হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু যদি বুঝা যায়, কোন অমুসলিম কুরআনকে অপমান করতে পারে তবে সে যাতে কুরআন ধরতে না পারে সে ব্যাপারে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া সকল মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

ফরজ গোসল অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা পড়া কত বড় গুনাহ

'ফরজ গোসল অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ করা নিষেধ' এ কথাটা কুরআনে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ কোনভাবেই বলা হয় নাই। কিন্তু কথাটা যেহেতু হাদীসে আছে, তাই এটা অবশ্যই ইসলামের বিষয়। তবে তা একটা অমৌলিক বিষয়।

কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে বা করতে বাধ্য হলে গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বিধান হচ্ছে-

- ❑ সমান গুরুত্ব ও পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে কোন গুনাহ হয় না। অর্থাৎ মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করার সময় প্রচণ্ড এবং অমৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করার সময় অল্প গুরুত্ব ও পরিমানের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে গুনাহ হয় না।
- ❑ কোন রকম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অর্থাৎ খুশি মনে বা ঘৃণাসহকারে একটি অমৌলিক আমলও কেউ না করলে কুফরীর গুনাহ হবে।

সুতরাং গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়লে বা স্পর্শ করলে-

- ❑ গুনাহ হবে না যদি ছোট-খাট গুরুত্বের ওজর, এবং অল্প পরিমাণের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।
- ❑ কোন রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অর্থাৎ খুশি মনে বা ঘৃণাসহকারে তা করলে কুফরীর গুনাহ হবে। যেমন ধরুন একজন ছাত্রীর কুরআনের পরীক্ষার আগে মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হলো। তার ঋতুস্রাব যদি ৫ দিন চলে আর ঐ ৫ দিন যদি সে কুরআন ধরে পড়তে না পারে, তবে তার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। এ জন্যে মাসিক চলা অবস্থায় তার কুরআন স্পর্শ করে পড়লে গুনাহ হবে না।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে ব্যক্তিগত কোন মতামত আপনাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। আর সিদ্ধান্ত দেয়ার কোন অবস্থানেও আমি নই। বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেকের যে তথ্যগুলো আমি পেয়েছি, জাতির অপরিসীম কল্যাণ হবে ভেবেই তা ব্যাখ্যাসহকারে উপস্থাপন করেছি। আর এ কাজ করার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিটি মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছে। আশা করি তথ্যগুলো জানার পর বিবেকবান এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না এমন যে কোন ব্যক্তির পক্ষে আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছা মোটেই কঠিন হবে না। আর যারা সিদ্ধান্ত দেয়ার অবস্থানে আছেন তাদের নিকট আমার আকুল আবেদন, উপস্থাপিত তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলো সামনে রেখে বিষয়টি নিয়ে আপনারা আবার একটু ভাবুন এবং এই দুর্ভাগা জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিন।

ইবলিস শয়তান তার এক নাম্বার কাজে (কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা) সফল হওয়ার জন্যে সর্বতভাবে চেষ্টা করবে সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম জাতি যদি ইসলাম বিরুদ্ধ কথাকে ধরে ফেলার জন্যে তাদের সবার মধ্যে মহান আল্লাহ বিবেক নামের যে শক্তিটি দিয়েছেন সেটাকে যথাস্থানে রাখে, তবে ইবলিসের পক্ষে ইসলাম বিরুদ্ধ কথা মুসলিম সমাজে ঢুকানো অসম্ভব হয়ে যাবে।

আসুন কায়মনোবাক্যে রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে ক্ষমতা এবং সুযোগ দেন, কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে সকল কুরআন-সুন্নাহ বিরুদ্ধ কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে, সেগুলো শনাক্ত করতে এবং তার প্রতিকারের জন্যে কার্যকরভাবে এগিয়ে আসতে। আমিন! ছুম্মা আমিন!

পরিশেষে সবার নিকট আবেদন, পুস্তিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে দয়া করে জানাবেন। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

বের হয়েছে–

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল আ. প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা এবং তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. 'শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?

প্রাপ্তিস্থান

- আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১
  শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ্ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩১
- দি বারাকাহ্ জেনারেল হাসপাতাল, ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন: ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৮২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।ফোন: ০১৯১২-০৪৩৫৪০
- ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭
- মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন: ৯৫৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে

লেখক পরিচিতি

ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমানের জন্ম বাংলাদেশের খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার আরাজি-ডুমুরিয়া গ্রামের এক ধার্মিক পরিবারে। নিজ গ্রামের মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষা জীবন আরম্ভ। ছয় বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তাঁকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ডুমুরিয়া হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে তিনি যথাক্রমে ডুমুরিয়া হাইস্কুল ও সরকারী বি.এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা থেকে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পাস করেন। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে **MBBS** পাস করেন। দ্বিতীয় ও ফাইনাল প্রফেশনাল **MBBS** পরীক্ষায় তিনি ঢাকা ভার্সিটিতে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান অধিকার করেন।

MBBS পাস করে তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯৭৯ সালে ইরাক সরকারের চাকুরী নিয়ে সেদেশে চলে যান। চার বছর ইরাকের জেনারেল হাসপাতালে সার্জারি বিভাগে চাকুরী করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯৮৬ সালে গ্লাসগো রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস থেকে জেনারেল সার্জারিতে **FRCS** ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে কনসালট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রফেসর অব সার্জারি এবং ল্যাপারোসকোপ **(Laparoscope)** যন্ত্রের দ্বারা পিত্তি থলির পাথর **(Gall Bladder Stone)** অপারেশনে, একক হাতে **(Single handed)** করা, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ সার্জন **(Surgeon)**